সূরা আল-আহযাব: ১ম রুকু (১-৮)আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sisters'Forum In Islam.com

জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)- এর বিয়ে নিয়ে নাস্তিক, মুনাফিক ও জাহিলদের অনেকধরনের কু মন্তব্য বক্তব্য।

উম্মুল মুমিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) এর সাথে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিয়ে নিয়ে নাস্তিক ও মুনাফিকদের চুলকানি অনেক পুরোনো। মদীনার মুনাফিকরা (নামধারী মুসলিমরা) তখনই এটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছিল, 'নবী মুহাম্মদ আমাদেরকে জানিয়েছেন, ছেলের বউ মাহরাম, তাকে বিয়ে করা যায় না। কিন্তু এখন দেখছি, তিনি নিজেই এই কাজ করেছেন।'

তাদের এই অপপ্রচারে দুর্বল ঈমানের ছাহাবীগণ প্রভাবিত হলে সূরা আহযাবের ৩৭-৪০ নম্বর আয়াত নাজিল হয় এবং বিষয়টির দায়-দায়িত্ব সরাসরি মহান আল্লাহ গ্রহণ করে নেন। তন্মধ্যে ৪০ নম্বর আয়াতে মুহাম্মদ (স.) কোনো পুরুষের পিতা নন বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, জায়েদ বিন হারেসা (রা.) কোনো ভাবেই রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সন্তান নন। দেখুন:

ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَلٰكِن رَسولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيّينَ ۗ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا

অর্থ: "মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" [সূরা আহযাব: ৪০]।-

অতঃপর আল্লাহ মুমিন ও মুনাফিক উভয় দলকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

অর্থ: "আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। আর তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা জিহার কর (তালাকের ইঙিত থেকে তাদেরকে নিজের মায়ের পিঠের মত বলে থাকো), তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আহযাব: ৪, ৫]।-

নাস্তিক ও মুনাফিকরা যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রসূল স: এর প্রতি ভক্তি, ভয় ও শ্রদ্ধা পোষণ করে না, তাই পার্থিব ও যৌন চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই তাদের সকল চিন্তা-কর্ম আবর্তিত হয়। ফলে তারা মুমিনদের এমনকি আল্লাহর রসূল স: এর কথাতেও আস্থা রাখতে পারে না। তারা নারী ও অর্থসহ পার্থিব সকল বিষয়ে সুবিধা ও ভোগ ছাড়া ত্যাগ ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষার নূন্যতম কল্পনাই করতে পারে না। অথচ মুমিনরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের জান, মাল, স্ত্রী ও সন্তানসহ যেকোনো বিষয়ের মায়া ত্যাগ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। আর মুনাফিকরা ব্যস্ত থাকে এসব মুমিনদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা ও তাদের গীবত ছড়ানোতে।

পশ্চিমা কাফির ও নাস্তিক এবং নামধারী মুসলিমদের বিশ্বাস ও চিন্তার জগত যেহেতু সঙ্কীর্ণ, তাই তারা মুমিনগণ ও আল্লাহর রসূল স: এর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

উদাহরণ স্বরূপ উম্মুল মুমিনীন জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) এর সাথে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়ে নিয়ে তারা খারাপ ধারণা পোষণ করে তথা অপবাদ দিয়ে বলে থাকে যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পোষ্য পুত্র হযরত জায়েদ বিন হারেসার (রা.) স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এতে জায়েদ বিব্রত হয়ে জয়নাবকে তালাক দেন এবং অতঃপর মুহাম্মদ (সা.) তাকে বিয়ে করেন।

এবার আসুন নাস্তিক ও মুনাফিকদের এই অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাবে।

জাহেলি যুগে প্রথা ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো পুত্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, তাহলে এ পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পুত্রের মত গণ্য হতো। এ পোষ্যপুত্ররা সব ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রের মর্যাদাভুক্ত হতো। তারা প্রকৃত সন্তানের মতো সম্পদের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সঙ্গে বিয়ে-শাদি হারাম, এ পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপ মনে করা হতো। বিয়ে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পর ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেমন হারাম, তদ্রুপ পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করাও হারাম বলে মনে করা হতো। ইসলাম আসার পর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর মাধ্যমে এই পোষ্য পুত্রতন্ত্র ও প্রথাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন।

এ জন্য মহান রব একটি ঘটনা ঘটিয়েছেন, যাতে ওই প্রথার সাথে সংশ্লিষ্ট অবাস্তব ধারণাগুলো সমাজ থেকে সফল ভাবে দূর হয়।

মূলত এখান থেকেই মহান আল্লাহর নির্দেশে জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) এর সাথে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিয়েটি সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

---কোরআন মজীদে নামোল্লিখিত একমাত্র ছাহাবী হলেন হযরত জায়েদ বিন হারেসা (রা.)। তিনি ছিলেন নুবুওয়াতের আগে (ইসলাম পূর্ব যুগে) উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রা.) থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া একজন আরবী গোলাম, যাকে নবীজি (স.) পরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং সন্তানের মত তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে মক্কার লোকেরা তাদের মাঝে প্রচলিত পোষ্য পুত্র প্রথার ধ্যান-ধারনা মতে তাকে জায়েদ বিন মুহাম্মদ (মুহাম্মদের ছেলে জায়েদ) বলে সম্বোধন করতো।

বিশিষ্ট ছাহাবী এই জায়েদ বিন হারেসার (রা.) সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো এই:

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানীর 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য মতে, হযরত জায়েদ বিন হারেসা (রা.) অন্যায় ভাবে বন্দী হয়ে গোলাম হিসেবে বিক্রিত হন। হাকিম বিন হিজাম বিন খুয়াইলিদ তাঁকে মক্কার উকাজ عكاظ বাজার থেকে ক্রয় করে স্বীয় ফুফু খাদিজা (রা.)-কে দান করেন। খাদিজা (রা.) তাঁকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতের জন্য উপহার হিসেবে দিয়ে দেন। পরে রসূলুল্লাহ (সা.) জায়েদকে (রা.) আজাদ করে দিয়ে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। জায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে দীর্ঘদিন ধরে পুত্রের মতো বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পিতা হারেসা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনুসন্ধান করার পর অবশেষে তাঁর সন্ধান পান। অতঃপর

তাঁর পিতা ও চাচা অর্থের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে তাঁদের সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আবেদন করেন। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা ইচ্ছা করলে বিনিময় ছাড়াই তাকে নিয়ে নিতে পারো। অথবা ইচ্ছা করলে আমার কাছেও রেখে যেতে পারো।" জায়েদ (রা.) তখন পিতার সাথে না গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে থেকে যেতে চান। এতে তারা পুত্রের ইচ্ছার কাছে হার মানেন এবং খুশী হয়ে ঘরে ফিরে যান। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন বলেন, "হে মানুষেরা! আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, জায়েদ আমার পুত্র। সে আমার ওয়ারিশ হবে। আর আমিও তার ওয়ারিশ হব।"

রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এর এ ঘোষণাটি ছিল জাহেলী যুগে (নুবুওয়াত তথা ইসলাম প্রচারের আগে)। পরবর্তীতে জাহেলী যুগের রীতিনীতি বাতিল করার এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ পোষ্য পুত্রতন্ত্রের ধারণাও বাতিল করে দিলেন। কারণ, এতে মানুষের আসল রূপ (পিতা ও বংশের পরিচয়) গোপন করা হয়, যা সত্যকে আড়াল করার মত।

পোষ্য পুত্রতন্ত্রের ধারণা বাতিল করার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশে রসূলুল্লাহ (সা.) চতুর্থ হিজরীতে স্বীয় ফুফাতো বোন জয়নাব বিনত জাহাশকে (রা.) জায়েদ বিন হারেসার (রা.) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন। আরবী হলেও জায়েদ (রা.) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন, তাই জয়নাব (রা.) এ বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا

অর্থ: "আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে তা অমান্য করার সুযোগ কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নেই। আর যে আল্লাহ ও সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টাতায় পতিত হয়।" (সুরা আহযাব: ৩৬)।

জয়নাব (রা.) এ আয়াত শুনে তাঁর অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে যান। অতঃপর চতুর্থ হিজরিতে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়েতে মোহরানা ধার্য করা হয় ১০ দিনার, যা প্রায় চার ভরি স্বর্ণ পরিমাণ। তা ছাড়া দেওয়া হয়েছিল একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালির আসবাবপত্র, আনুমানিক ২৫ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর। মহানবী (সা.) নিজের পক্ষ থেকে তা প্রদান করেছিলেন। (ইবনে কাসির)।

স্বাভাবিকত হযরত জায়েদ বিন হারেসার সঙ্গে জয়নব (রা.)-এর চিন্তা-চলনের মিল হয়নি। কারণ, উভয়ের বংশ ও ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে জায়েদ (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জয়নাব (রা.) সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং জয়নাবকে (রা.) তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা.) যদিও বুঝে নিয়েছিলেন যে, উভয়ের মাঝে কুফূ (বংশ ও সামাজিক মর্যাদাগত সমতা) না হওয়ায় বিচ্ছেদ অনিবার্য, কিন্তু মানুষের মাঝে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় (জাহেলী যুগের প্রথানুযায়ী এ অপবাদ রটানো যে, নবী মুহাম্মদ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন) জায়েদকে তালাক থেকে নিষেধ করেন। তবে তিনি জায়েদ (রা.) ও জয়নাব (রা.) উভয়ের বিচ্ছেদের অনিবার্যতা বুঝে মনে মনে ভাবছিলেন যে, বিচ্ছেদ হলে তিনি জয়নাবকে (রা.) বিয়ে করবেন। কারণ, একজন নবী হিসেবে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জাহেলী যুগের পোষ্য পুত্রতন্ত্রের ধারণা বাতিল করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বিষয়টা (জয়নাবকে বিয়ে করার ইচ্ছা) মানুষের বিরূপ ধারণার আশঙ্কা থেকে কাউকে স্পষ্ট করে বলতে পারছিলেন না। কিন্তু হযরত জায়েদ বিষয়টি বুঝতে পারেন। তাই তিনি

তাঁর জন্য অনুপযুক্ত স্ত্রী জয়নাবকে (রা.) তালাক দিয়ে দেন। পরে আল্লাহর কাছ থেকে ইঙিত পেয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) জয়নাবকে (রা.) বিয়ে করেন। এ বিয়ে সম্পন্ন হয় জায়েদ (রা.) এর বিয়ের এক বছরের মধ্যে (পঞ্চম হিজরিতে)। তখন রসুলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স ছিল ৫৮ বছর।

আর এ বিয়ে নিয়ে যাতে কোনো মুমিন বাজে ধারণা পোষণ করতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহ সূরা আহযাবের এই আয়াতটি নাজিল করলেন:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

অর্থ: "স্মরণ করো সেসময়ের কথা, যখন আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তুমি নিজের কাছেই রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। তখন আপনি (আপনার) অন্তরে এমন বিষয় (জায়েদ ছেড়ে দিলে বিয়ে করে জয়নাবকে সম্মানিত করার ইচ্ছা) গোপন করেছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন (জায়েদ কর্তৃক জয়নাবকে তালাক দেওয়া ও পরে রসূলুল্লাহ (স.) এর তাকে বিয়ে করার মাধ্যমে)। আর আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন, অথচ আল্লাহকেই আপনার অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে (পোষ্য পুত্রের পালনকারীদের) বিয়ে করার ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে।" (সুরা : আহযাব: ৩৭)।

তো উপর্যুক্ত কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়টি দিবালোকের মত পরিস্কার হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রস্তাবে হযরত জায়েদ (রা.) কর্তৃক জয়নাব বিনতে জাহাশকে (রা.) বিয়ে করা, অতঃপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া এবং এর পরে তাঁকে রসূলুল্লাহ (সা.) এর বিয়ে করা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর ইঙ্গিত ও নির্দেশে সঙ্ঘটিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ কেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সা.)- এর মাধ্যমে এমন একটা কাজ করালেন, তার জবাবও তিনি এই আয়াতে স্পষ্ট করেছেন। আর তা হলো, পোষ্য পুত্রের তালাক দেওয়া স্ত্রীকে যাতে বিয়ে করতে কোন মুমিনের কষ্ট না হয়। আর এখান থেকে ইসলামের বিবাহ নীতির যৌক্তিকতা ও সহজতা যেকোনো লোকের বোধগম্য হয়ে উঠার কথা।

এখন যদি ছাহাবা-তাবেয়ী সমাজের কোনো জাহিল কিংবা মুনাফিক অথবা বর্তমান যুগের কোনো ভন্ড নাস্তিক কিংবা জাহিল ও নির্বোধ মুসলিম ভেবে থাকে যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ফুফাতো বোন জয়নাব বিনতে জাহাশের (রা.) প্রতি আসক্তি অনুভব করায় জায়েদ (রা.) তাঁকে তালাক দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বিয়ে করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাহলে সে সরাসরি কোরআনকেই অস্বীকার করল, যা সুস্পষ্ট কুফরী।

সত্য হলো, হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রতি সুধারণা ও শ্রদ্ধায় যদি কোনো মুসলিমের সামান্যতমও ত্রুটি ঘটে, তাহলে তার ঈমান নিশ্চিত বিপদে পড়বে। এতে সে নিফাকের জগতে প্রবেশ করে জাহান্নামের খোরাক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) ছিলেন হযরত জায়েদ বিন হারেসার (রা.) দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করার আরো অন্তত ১৩ বছর আগে মক্কায় রসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রস্তাবে তিনি বিধবা উম্মে আইমনকে বিয়ে করেছিলেন। ওই ঘরে তাঁর ছেলে উসামা বিন জায়েদ (রা.) এর জন্ম হয়। জয়নাব (রা.) এর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সপ্তম হিজরীতে তিনি (হযরত জায়েদ বিন হারেসা) মুহাজির ছাহাবিয়া কুমারী উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাকে (রা.) বিয়ে করেন। এর পরের বছর (অষ্টম হিজরতে) তিনি মুতার যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

উল্লেখ্য, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর স্ত্রী ও ফুফাতো বোন জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) খুবই দয়ালু ও দানশীল নারী ছিলেন। নবীজি (স.) একদিন স্ত্রীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

أسرعُكنَّ لحاقاً بي أطولكنَّ يدا.

"তোমাদের মধ্যে যার হাত অধিক লম্বা (অর্থাৎ, যে অধিক দানশীল), সে আমার সাথে (পরকালে) সবার আগে সাক্ষাত করবে।" [ছহীহ বোখারী (১৪২০) ও ছহীহ মুসলিম (২৪৫২)]।

পরে দেখা গেছে জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) সবার আগে ইন্তেকাল করেছেন। আর তা ২০ হিজরীতে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ইন্তেকাল দশ বছর পর। ওই সময় তাঁর বয়স কত ছিল তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো ৫৩ বছর। তবে প্রসিদ্ধ মত হলেই সব সঠিক হয় না। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অনেক তথ্যই ভুল ও স্ববিরোধী।

আরেকটি বিষয় হলো, হযরত জায়েদ (রা.) এর আগে জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর অন্য কোথাও বিয়ে হয়েছিল কি না তার কোনো তথ্য হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে নেই। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রথমে বিধবা উম্মে আইমনকে (রা.) বিয়ে করা জায়েদ বিন হারেসার (রা.) দ্বিতীয় স্ত্রী জয়নাব (রা.) কুমারী ছিলেন। অনুরূপ তাঁর তৃতীয় স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাও (রা.) কুমারী ছিলেন। আবুল হুসাইন আলেগাজী লেখা থেকে সংগৃহিত

এবার আয়াতের তাফসীরে প্রবেশ করিঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴾ ১ : ৩৩

১. হে নবী! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

ভূমিকায় বর্ণনা এসেছে, এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয় যখন হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে (রা.) তালাক দিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ নিজেও অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহর ইশারাও এটিই ছিল যে, দত্তক সম্পর্কের ব্যাপারে জাহেলীয়াতের রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের ওপর আঘাত হানার এটিই মোক্ষম সময়। নবীর ﷺ নিজেকে অগ্রসর হয়ে তাঁর দত্তক পুত্রের (যায়েদ) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত। এভাবে এ রেওয়াজটি চূড়ান্তভাবে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু যে কারণে নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করেছিলেন তা ছিল এ আশঙ্কা যে, এর ফলে তাঁর একের পর এক সাফল্যের কারণে যে কাফের ও মুশরিকরা পূর্বেই ক্ষিপ্ত হয়েই ছিল এখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করার জন্য তাঁরা একটি শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যাবে।

এটা তাঁর নিজের দুর্নামের আশঙ্কা জনিত ভয় ছিল না। বরং এ কারণে ছিল যে, এর ফলে ইসলামের উপর আঘাত আসবে, শত্রুদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মাবে, বহু নিরপেক্ষ লোক শত্রুপক্ষে যোগ দেবে এবং স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল বুদ্ধি ও মননের অধিকারী তারা সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবে। তাই নবী ﷺ মনে করতেন, জহেলীয়াতের একটি রেওয়াজ পরিবর্তন করার জন্য এমন পদক্ষেপ উঠানো কল্যাণকর নয় যার ফলে ইসলামের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত যির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "সূরায়ে আহযাবের কতটি আয়াত গণনা করা হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ " তেহাত্তরটি।" তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "না, না। আমি তো দেখেছি যে, এ সূরাটি প্রায় সূরায়ে বাকারার সমান ছিল। এই সূরার মধ্যেই নিম্নের আয়াতটিও আমরা পাঠ করতামঃ (আরবি)অর্থাৎ "বুড়ো ও বুড়ী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেললো, এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" এর দ্বারা জানা যায় যে, এই সূরার কতকগুলো আয়াত আল্লাহর নির্দেশক্রমে রহিত হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১-৩ নং আয়াতের তাফসীর সতর্ক করার সুন্দর পন্থা এই যে, বড়দেরকে বলতে হবে যাতে ছোটরা তা শুনে সাবধান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে যখন কোন কথা গুরুত্বের সাথে বলেন তখন বুঝে নিতে হবে যে, অন্যের জন্যে এর গুরুত্ব আরো বেশী। আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী পুণ্য লাভ করার নিয়তে তাঁর ফরমানের আনুগত্য করা এবং তাঁর ফরমান অনুযায়ী তার শাস্তি থেকে বাচার উদ্দেশ্যে তাঁর নাফরমানী পরিত্যাগ করার নাম হলো তাকওয়া। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা না মানা, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা এবং স্বীকার করে নেয়ার নিয়তে তাদের কথা না শোনার নামও তাকওয়া। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তাঁর প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের ফল বা পরিণাম সম্যক অবগত। তার সীমাহীন হিকমতের কারণে তার কোন কাজ, কোন কথা বিবেচনা ও নীতি বহির্ভূত হয় না। তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ অতএব তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তারই অনুসরণ কর, যাতে তুমি খারাপ পরিণতি ও বিভ্রান্তি হতে বাঁচতে পার। আল্লাহ তা'আলার কাছে কারো ক্রিয়াকলাপ গোপন নেই। নিজের সমস্ত কাজকর্মে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর। তার উপর যে ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট হন। কারণ তিনি সমস্ত কাজের উপর পূর্ণ শক্তিশালী। তাঁর প্রতি যে আকৃষ্ট হয় বা তাঁর দিকে যে ঝুঁকে পড়ে সে সফলকামই হয়ে থাকে।

৩৩ : ২ وَّ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

২. আর আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয় তার অনুসরণ করুন; নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। কারণ হাদীসের শব্দ যদিও নবী (সাঃ)-এর বরকতময় মুখনিঃসৃত বাণী, কিন্তু তার অর্থ ও ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এই জন্য হাদীসকে 'অহী খাফী' বা 'অহী গায়র মাতলু' বলা হয়েছে।

হাদীসকে ‘ওহী খফি’ (গোপন ওহী) বা ‘ওহী গায়র মাতলু’ (যা তিলাওয়াত করা হয় না) বলা হয়, কারণ এর ভাব বা অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসলেও, এর শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এটি কুরআনের মতো নামাজে তিলাওয়াত করা হয় না

ওহী ও হাদিসের পার্থক্য

ওহী মাতলু (কুরআন): শব্দ ও অর্থ দুটিই আল্লাহর। সালাতে বা নামাজে তিলাওয়াত করা হয়। মুতাওয়াতির সূত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

ওহী গায়র মাতলু (হাদিস বা সুন্নাহ):মূল অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর। সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না

পবিত্র কুরআনের দলিলঃ

সূরা আন-নাজম (আয়াত: ৩-৪):"আর তিনি (রাসূল) নিজের ইচ্ছা থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়।"ব্যাখ্যা: এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা-ই বলতেন (যা হাদীস হিসেবে সংরক্ষিত), তা আল্লাহর ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

সুনানে আবু দাউদ (হাদীস নং ৪৬০৪): রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "মনে রেখো! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তারই মতো আরেকটি জিনিস (হাদীস/সুন্নাহ) দেওয়া হয়েছে।

"ব্যাখ্যা: এখানে 'তারই মতো আরেকটি জিনিস' বলতে ওহী গায়রে মাতলু বা হাদীসকে বোঝানো হয়েছে।

এ বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, মুসলমানদেরকে ও ইসলাম বিরোধীদেরকেও। এর অর্থ হচ্ছে নবী যদি আল্লাহর হুকুম পালন করে দুর্নামের ঝুঁকি মাথা পেতে নেন এবং নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর শত্রুর আক্রমণ ধৈর্য সহকারে বরদাশ্‌ত করেন তাহলে তাঁর বিশ্বস্তামূলক কর্মকাণ্ড আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে না। মুসলমানদের মধ্য থেকে যেসব লোক নবীর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিচল থাকবে এবং যারা সন্দেহ-সংশয়ে ভুগবে তাদের উভয়ের অবস্থাই অগোচরে থাকবে না। কাফের ও মুনাফিকরা তাঁর দুর্নাম করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর থাকবেন না। কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেকে যার যার কার্য অনুযায়ী যে পুরস্কার বা শাস্তি লাভের যোগ্য হবে তা সে অবশ্যই পাবে।

আল-খাবীর (সম্যক অবগত, সর্বজ্ঞ)

আল্লাহর ইলমে সব কিছু বেষ্টন করে রাখা ও তাঁর জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা গননা করা অসম্ভব। আসমান ও জামিনে তাঁর ইলমের বাইরে একটি সরিষা কণা বা তারচেয়েও ক্ষুদ্র কোন কিছু গোপন থাকে না। ছোট-বড় কোন কিছুই তাঁর অগোচরে থাকে না এবং তিনি কিছুই ভুলে যান না। আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৩৬-৩৭। আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন,

﴿سَوَآءٞ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۢ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠﴾ [الرعد: ١٠]

“তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখুক বা প্রকাশ করুক। আর রাতে লুকিয়ে করুক বা দিনে প্রকাশ্যে করুক, সবই তাঁর নিকট সমান।” [সূরা আর-রাদ: ১০]

﴿وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ٥٩﴾ [الانعام :٥٩]

“‘‘আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন এবং জমিনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু সব কিছু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।” [সূরা আল-আন ‘আম আয়াত: ৫৯]

“তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।” [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ৭]

وَّ تَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ٣ : ৩৩

৩. এবং আপনি নির্ভর করুন আল্লাহর উপর। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

এ বাক্যে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তা সম্পন্ন করো এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি বিরোধিতায় এগিয়ে আসে তাহলেও তার পরোয়া করো না। মানুষ যখন নিশ্চিত ভাবে জানবে উমুক হুকুমটি আল্লাহ দিয়েছেন তখন সেটি পালন করার মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে তার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এরপর তার মধ্যে কল্যাণ, সুবিধা ও প্রজ্ঞা খুঁজে বেড়ানো সেই ব্যক্তির নিজের কাজ নয় বরং কাজ হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাঁর হুকুম পালন করা। বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যথেষ্ট এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তাঁর পথনির্দেশের আলোকে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না।

আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং আল্লাহ্‌ই কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট। সূরা নিসাঃ ৮১

আল্লাহর নিকট আপনার কাজকে সোপর্দ করে, তার উপর তাওাক্কুল করে, তার ওয়াদাকে বিশ্বাস করে, তার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে, তার প্রতি সুধারণা পোষণ করে এবং তার সাহায্যের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে আপনি ঈমানের কিছু মহাফল লাভ করতে পারবেন এবং ঈমানদারের অধিকতর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে পারবেন। যখন আপনি আপনার চরিত্রে এ গুণসমূহকে সংযুক্ত করে নিবেন, তখন আপনি আগামী দিনগুলোতে কোন দুশ্চিন্তা না করে বরং শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারবেন। ফলে আপনি নিজের প্রতি যত্ন, সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয় লাভ করবেন।

ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে ফেলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক।" ফলে আল্লাহ তায়ালা আগুনকে ইব্রাহীমের (আঃ)-এর জন্য শীতল, নিরাপদ ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন। حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক!" (আলে ইমরান:১৭৩)

"আর যদি তোমরা সত্যিকার মু' মিন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।" (৫-সূরা মায়িদা: আয়াত-২৫)

যারা নিজেদের কল্যাণ করতে চান, তারা নিজেদের বিপর্যয় ও দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বশক্তিমান ও সর্বাপেক্ষা উত্তম অভিভাবক আল্লাহর উপর নির্ভর করুন এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক!-এ নীতিবাক্য অনুসারে জীবন যাপন করুন।

৩৩ : ৪ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَ اللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

৪. আল্লাহ কোন মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। আর তোমাদের স্ত্রীগণ, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি; এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একজন মুনাফিক দাবী করত যে, তার দু' টি অন্তর আছে। একটি মুসলিমদের সাথে ও অপরটি কুফর ও কাফেরেদের সাথে। (আহমাদ ১/২৬৭) উক্ত আয়াত তার কথা খন্ডন করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, একই অন্তরে আল্লাহর মহববত ও তাঁর শত্রুর আনুগত্য একত্রিত হওয়া অসম্ভব।

কেউ কেউ বলেন যে, মক্কার মুশরিকদের মধ্যে জামীল বিন মা' মার ফিহ্রী নামক এক ব্যক্তি ছিল, সে বড় হুঁশিয়ার, চতুর ও ধোঁকাবাজ ছিল। তার দাবী ছিল যে, আমার দু' টি অন্তর আছে যার দ্বারা আমি চিন্তা ভাবনা করি ও বুঝি। আর মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অন্তর একটি। এই আয়াত তারই রদ স্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। (আইসারুত তাফসীর)

পক্ষান্তরে কিছু তফসীরবিদগণ বলেন যে, সামনে যে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এটা তারই ভূমিকা। অর্থাৎ, যেরূপ এক ব্যক্তির দুই অন্তর হয় না, অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে ফেলে; অর্থাৎ বলে ফেলে যে, 'তোমার পিঠ আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত' তাহলে এ কথা বলাতে তার স্ত্রী তার মা হয়ে যাবে না। কারণ একজনের দুই মা হয় না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি কাউকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিলে সে তার প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না। বরং সে যার পুত্র তারই থাকে, তার দুই বাপ হতে পারে না। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতে 'যিহার'-এর দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরা মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরা আল-মুজাদালায়' আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যিহারের কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। [দেখুন: মুয়াস্সার; বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

যিহার হ' ল স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মা বা স্থায়ী মাহরামের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা (নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯১ 'যিহার' অনুচ্ছেদ)। আর এরূপ যিহারের কাফ্ফারা হ' ল স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা এক টানা দু' মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে (মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)। এক্ষণে কাফফারা হিসাবে দাসমুক্তির সুযোগ না থাকায় প্রথমতঃ ধারাবাহিকভাবে দুই মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে। এতে অক্ষম হ' লে ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়াবে (মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)। উল্লেখ্য যে, কাফফারার ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই ফেলে, তাহলে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় স্ত্রী স্পর্শ করবে না (ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫)।

যিহারের কাফফারা মোট ৩টি ধাপে সাজানো হয়েছে। এই ধাপগুলো ক্রমানুসারে (একটির পর একটি) পালন করতে হয়।

১. প্রথম ধাপ: দাস মুক্তি করা- যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, তাই এই ধাপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাদ পড়ে যায় এবং সরাসরি দ্বিতীয় ধাপে চলে যেতে হয়

২. দ্বিতীয় ধাপ: একটানা দুই মাস রোজা রাখা

৩. তৃতীয় ধাপ: ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো, এই ধাপে ৬০ জন মিসকিন বা দরিদ্র মানুষকে দুই বেলা পেট ভরে মধ্যম মানের খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য বা খাদ্যশস্য সদকা করতে হবে।

<u>দ্বিতীয় বিষয়</u> পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দুটি অন্ত:করণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। [দেখুন: মুয়াস্সার, সা' দী] অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

একজন লোক একই সঙ্গে মু' মিন ও মুনাফিক, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং সৎ ও অসৎ হতে পারে না। তার বক্ষ দেশে দু' টি হৃদয় নেই যে, একটি হৃদয়ে থাকবে আন্তরিকতা এবং অন্যটিতে থাকবে আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া ভাব।

কাজেই একজন লোক এক সময় একটি মর্যাদারই অধিকারী হতে পারে। সে মু' মিন হবে অথবা হবে মুনাফিক। সে কাফের হবে অথবা হবে মুসলিম। এখন যদি তোমরা কোন মু' মিনকে মুনাফিক বলো অথবা

মুনাফিককে মু’ মিন, তাহলে তাতে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আসল মর্যাদা অবশ্যই একটিই থাকবে।

কোনো মুমিন বান্দার অন্তরে খাঁটি ঈমান এবং ধ্বংসাত্মক হিংসা একত্রে স্থায়ী হতে পারে না। [সহীহুল জামে: ৭৪৯৬]

সহীহ মুসলিমের আরেকটি হাদিসে এসেছে, নবীজি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের অন্তরে একই সাথে ঈমান এবং হিংসা জড়ো হতে পারে না।"

এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ ইবন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে সম্বোধন করতাম। [বুখারী: ৪৭৮২, মুসলিম: ২৪২৫] কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়।

হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি নিজেকে আপনি পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তাঁর পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।” [বুখারী: ৪৩২৬, মুসলিম: ৬৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা তোমাদের পিতাদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া থেকে বিমুখ হয়োনা, যে তার পিতা থেকে বিমুখ হয় সে কুফরী করল।’ [মুসলিম: ৬২]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন মানুষ যখন না জেনে কোন নসব প্রমান করতে যায় বা অস্বীকার করতে যায় তখন সে কুফরী করে, যদিও তা সামান্য হোক।” [ইবনে মাজাহ: ২৭৪৪]

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ؕ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ৩৩ : ৫

৫. ডাকো তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র নিকট এটাই বেশী ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ হুকুমটি পালন করার জন্য সর্বপ্রথম যে সংশোধনমূলক কাজটি করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হযরত যায়েদকে (রা.) যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলার পরিবর্তে তাঁর প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কিত করে যায়েদ ইবনে হারেসাহ বলা শুরু করা হয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি ও নাসাঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে প্রথমে সবাই যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলতো। এ আয়াত নাযিল হবার পর তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেসাহ বলা হতে থাকে। তাছাড়া এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তি নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ

হযরত সা' দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের (রা.) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেনঃ

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"যে ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে যায়েদ (রাঃ) ইবনে মুহাম্মাদ (সঃ) বলতাম। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এটা বলা পরিত্যাগ করি। পূর্বে তো পালক পুত্রের ঐ সমুদয় হক থাকতো যা ঔরষজাত ছেলের থাকে।"

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সালেহ বিনতে সুহায়েল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সালিম (রাঃ)-কে মৌখিক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলাম। এখন কুরআন তার ব্যাপারে ফায়সালা করে দিয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত তার থেকে পর্দা করিনি। সে আসে এবং যায়। আমার স্বামী হযরত হুযাইফা (রাঃ) তার এভাবে যাতায়াতে কিছুটা অসন্তুষ্ট রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "তাহলে যাও, সালিম (রাঃ)-কে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। এতে তুমি তার উপর হারাম হয়ে যাবে (শেষ পর্যন্ত)।"মোটকথা পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যায়।

৩৩ : ৬ اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ وَ اَزۡوَاجُہٗۤ اُمَّہٰتُہُمۡ ؕ وَ اُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُہُمۡ اَوۡلٰی بِبَعۡضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰہِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُہٰجِرِیۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِکُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا

৬. নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে—যারা আত্মীয় তারা পরস্পর কাছাকাছি। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কল্যাণকর কিছু করার কথা আলাদা। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলিমদের এবং মুসলিমদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক।

নবী ও মুমিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের জন্য তাদের বাপমায়ের চাইতেও বেশী স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই মুসলিমদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে তখন তারা তাকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তার মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তার ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তার প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। তাই

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে ওটা মেনে না নেয়।" (আন নিসা : ৬৫)

হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তানসন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।" [বুখারী: ১৪, মুসলিম: ৪৪]

সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু হতেই প্রিয়।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! না (এতেও তুমি মুমিন হতে পার না), বরং আমি যেন তোমার কাছে তোমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় হই।" তখন তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ! (এখন হতে) আপনি আমার নিকট সব কিছু হতেই প্রিয় হয়ে গেলেন। এমনকি আমার নিজের জীবন হতেও।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! এখন (তুমি পূর্ণ মুমিন হলে)।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নবী (সঃ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত মুমিনের সবচেয়ে বেশী হকদার আমিই, এমনকি তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও। তোমরা ইচ্ছা করলে। (আরবি)-এই আয়াতটি পড়ে নাও। জেনে রেখো যে, যদি কোন মুসলমান মাল-ধন রেখে মারা যায় তবে সেই মালের হকদার হবে তার উত্তরাধিকারীরা। আর যদি কোন মুসলমান তার কাঁধে ঋণের বোঝা রেখে মারা যায় অথবা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায় তবে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার এবং তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব ভারও আমারই উপর ন্যাস্ত।"

এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মন চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত পাঠ করতে পার।" [বুখারী: ২৩৯৯]

**** রাসূলের পূণ্যবতী স্ত্রীগণকে সকল মুসলিমের মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা-পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া, মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর রাসূলের পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। মোটকথা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মুমিনদের মাতা যে, তাদেরকে সম্মান করা মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তারা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলিম তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাদের মেয়েরা মুসলিমদের জন্য বৈপিত্রয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাদের ভাই ও বোনেরা মুসলিমদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস লাভ করে তাদের তরফ থেকে কোন অনাত্মীয় মুসলিম সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে না। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর; মুয়াস্‌সার, বাগভী]

***** এ আয়াতের মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক চুক্তির বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। হিজরতের পর পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। যার কারণে তাদের একজন অপরজনের ওয়ারিশ হতো। এটা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তারপর যখন প্রত্যেকের অবস্থারই পরিবর্তন হলো তখন এ নীতির কার্যকারিতা রহিত করে যাবিল আরহামদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো। [তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

হযরত যুহায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ "এই হুকুম বিশেষভাবে আমাদের আনসার ও মুহাজিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় আগমন করি তখন আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। এখানে (মদীনায়) এসে আমরা আনসারদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। তারা আমাদের উত্তম ভাই সাব্যস্ত হন। এমনকি তাদের মৃত্যুর পর আমরা তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতাম। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর সাথে। হযরত উমার (রাঃ)-এর হয়েছিল অমুকের সাথে।

হযরত উসমান (রাঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন একজন যারকী ব্যক্তির সাথে। আর স্বয়ং আমার ভাই হয়েছিলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। ঐ সময় তার ইন্তেকাল হলে আমিও তার ওয়ারিস হয়ে যেতাম। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং মীরাসের সাধারণ হুকুম আমাদের জন্যেও প্রযোজ্য হয়ে গেল । এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তবে তা করতে পার। তুমি তার জন্যে অসিয়ত করে যেতে পার। অতঃপর

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর এই হুকুম প্রথম হতেই এই কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি। মধ্যখানে পাতানো ভাই-এর উপর যে ওয়ারিসী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটা শুধু একটা বিশেষ যুক্তিসঙ্গতার ভিত্তিতে হয়েছিল একটা বিশেষ ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর এটা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন মূল হুকুম জারী হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

***** এ আয়াতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহফা, উপঢৌকন বা আসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দ্বীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

وَ اِذۡ اَخَذۡنَا مِنَ النَّبِیّٖنَ مِیۡثَاقَهُمۡ وَ مِنۡكَ وَ مِنۡ نُّوۡحٍ وَّ اِبۡرٰهِیۡمَ وَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسَی ৩৩ : ৭
ابۡنِ مَرۡیَمَ ۪ وَ اَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا ۙ﴿۷

৭. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও৷ আর আমরা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার–

لِّیَسۡـَٔلَ الصّٰدِقِیۡنَ عَنۡ صِدۡقِهِمۡ ۚ وَ اَعَدَّ لِلۡكٰفِرِیۡنَ عَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿۸ ৩৩ : ৮

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭-৮ নং আয়াতের তাফসীরআল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি এই পাঁচজন স্থিরপ্রতিজ্ঞ নবীর নিকট হতে এবং সাধারণ সমস্ত নবীর নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তারা আমার দ্বীনের প্রচার করবেন ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তারা পরস্পরে একে অপরকে সাহায্য করবেন এবং একে অপরকে সমর্থন করবেন। যেমন

তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেনঃ তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ! যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেনঃ তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বললো: আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" আলে ইমরান:৮১)

এখানে সাধারণ নবীদের বর্ণনা দেয়ার পর বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন নবীদের নামও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের নাম নিম্নের আয়াতেও রয়েছেঃ

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন দ্বীন নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা অহির মাধ্যমে দান করা হয়েছে (হে মুহাম্মাদ) তোমাকে। আর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাগিদ সহকারে যে, তোমরা প্রতিষ্ঠিত করবে এ দ্বীনকে এবং এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।" (আশ শূরা, ১৩)

এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যিনি ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম নবী ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা ছিলেন মধ্যবর্তী নবী। এতে সূক্ষ্মদর্শিতা এই রয়েছে যে,

প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর পরবর্তী নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। আর মধ্যবর্তী নবীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তো এই ক্রমপর্যায় রয়েছে যে, প্রথম ও শেষের নাম উল্লেখ করার পর মধ্যবর্তী নবীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আর এ আয়াতে সর্বপ্রথম সর্বশেষ নবী (সঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নবী। অতঃপর একের পর এক ক্রমানুযায়ী অন্যান্য নবীদের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবীর উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন! হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে পাঁচজন নবী আল্লাহ তা'আলার নিকট খুইব পছন্দনীয়। তাঁরা হলেনঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)।

আর স্মরণ করো, আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল এজন্য যে, তোমরা তার শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং তা লুকাবে না।" (আলে ইমরান, ১৮৭)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

"আর স্মরণ করো, আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।" (আল বাকারাহ, ৮৩)

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ....خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"তাদের থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি?------সেটিকে মজবুতভাবে ধরো যা আমি তোমাদের দিয়েছি এবং সেই নির্দেশ মনে রাখো যা তার মধ্যে রয়েছে। আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকবে।" (আল আরাফ, ১৬৯-১৭১)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

"আর হে মুসলমানরা! মনে রেখো আল্লাহর অনুগ্রহকে, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন এবং সেই অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" (আল মা-য়েদাহ, ৭)

নবী ﷺ শত্রুদের সমালোচনার আশঙ্কায় পালক সন্তানের আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের নিয়ম ভাংতে ইতস্তত করছিলেন বলেই মহান আল্লাহ এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেহেতু ব্যাপারটা একটি মহিলাকে বিয়ে করার, তাই তিনি বারবার লজ্জা অনুভব করছিলেন। তিনি মনে করছিলেন, আমি যতই সৎ সংকল্প নিয়ে নিছক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই কাজ করি না কেন শত্রু একথাই বলবে, প্রবৃত্তির তাড়নায় এ কাজ করা হয়েছে এবং এ ব্যক্তি নিছক ধোঁকা দেবার জন্য সংস্কারকের খোলস নিয়ে আছে। এ কারণেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি আমার নিযুক্ত পয়গম্বর, সকল পয়গম্বরদের মতো তোমার সাথেও আমার এ মর্মে অলংঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, আমি যা কিছু হুকুম করবো তাই তুমি পালন করবে এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার হুকুম দেবে। কাজেই কারো তিরস্কার সমালোচনার পরোয়া করো না, কাউকে লজ্জা ও ভয় করো না এবং তোমাকে দিয়ে আমি যে কাজ করাতে চাই নির্দ্বিধায় তা সম্পাদন করো।

একটি দল এ অঙ্গীকারকে একটি বিশেষ অঙ্গীকার অর্থে গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের সকল নবীর কাছ থেকে এ অঙ্গীকারটি নেয়া হয়। সেটি ছিল এই যে, তাঁরা পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করবেন। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ দলের দাবী হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেও নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকেও এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে যে, তাঁর পরেও যে নবী আসবে তাঁর উম্মাত তার প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি এসেছে সেখানে তাঁর পরও নবী আসবে এবং তাঁর উম্মাতের তার প্রতি ঈমান আনা

উচিত, একথা বলার কোন অবকাশই নেই। এর এ অর্থ গ্রহণ করলে এ আয়াতটি এখানে একেবারেই সম্পর্কহীন ও খাপছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া এ আয়াতের শব্দগুলোয় এমন কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যা থেকে এখানে অঙ্গীকার শব্দটির সাহায্যে কোন্ ধরনের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে তা বুঝা যেতে পারে। অবশ্যই এর ধরন জানার জন্য আমাদের কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় নবীদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকারসমূহের কথা বলা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি ফিরাতে হবে। এখন যদি সমগ্র কুরআন মজীদে শুধুমাত্র একটি অঙ্গীকারের কথা বলা হতো এবং তা হতো পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের প্রতি ঈমান আনার সাথে সম্পর্কিত তাহলে এখানেও ঐ একই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে একথা দাবী করা যথার্থ হতো। কিন্তু যে ব্যক্তিই সচেতনভাবে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে সে জানে এ কিতাবে নবীগণ এবং তাঁদের উম্মাতদের থেকে গৃহীত বহু অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এসব বিভিন্ন ধরনের অঙ্গীকারের মধ্যে থেকে যে অঙ্গীকারটি এখানকার পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে একমাত্র সেটির কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা সঠিক হবে। এখানে যে অঙ্গীকারের উল্লেখের কোন সুযোগই নেই তার কথা এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করা কখনই সঠিক নয়। এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কিছু লোক কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার নয় বরং কুরআনকে হিদায়াত করার কাজে ব্যাপৃত হয়।

******* ইসলামি ফিকহে যিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। কারণ এর সাথে দাম্পত্য জীবনের হালাল-হারামের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান জড়িয়ে আছে। তাছাড়া জাহেলি যুগ থেকে চলে আসা এর অব্যবহারে ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

তাই নিম্নে যিহারের সংজ্ঞা, এর কাফফারা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি কিছু বিধান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হল: وبالله التوفيق

- ## যিহার কী?

সম্মানিত ফিকাহবিদগণ যিহার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه

“স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনও মাহরাম নারীর সাথে সাদৃশ্য দেওয়াকে যিহার বলা হয়।”

অথবা تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه “বিবাহিত স্ত্রীকে এমন মহিলার সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যে তার জন্য হারাম।” [শারহু যাদিল মুস্তাকনি-শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার শানকিতি। শাইখ উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন মাজহাবের আলোকে যিহারের আরও একাধিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন]

উদাহরণ: কোনও পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম যেমন আমার মা আমার জন্য হারাম বা যেমন আমার বোন আমার জন্য হারাম...বা এ জাতীয় বাক্য তাহলে এটাকে যিহার বলা হয়। এর বিভিন্ন রূপ আছে এবং সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও কিছু ভিন্নতা আছে-যেগুলো ফিকহের কিতাব সমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

যিহার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

"তোমাদের মধ্যের যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' (মায়ের মত হারাম বলে ঘোষণা করে) করে- তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনা কারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা মুজাদিলা: ২]

সাধারণত: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে স্বামীর পক্ষ থেকে রাগ বশত: যিহার সংঘটিত হয়। যেমন: তাফসিরে উল্লেখ করা হয় যে, খাওলা বিনত সালাবা এবং তার অতিবৃদ্ধ স্বামী আউস ইবনুস সামিত রা. এর মাঝে মনোমালিন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে আউস রা. ক্রোধান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, «أنتِ عليَّ كظهرِ أمّي» "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত।" অর্থাৎ আমার মা যেমন, আমার উপর হারাম তেমনি তুমিও আমার জন্য হারাম। জাহেলি যুগে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে এভাবে বলতো।

যাহোক ঘটনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাদের মাঝে সমঝোতা করার চেষ্টা করছিলেন ইত্যবসরে তার উপর সূরা মুজাদালার জিহার সংক্রান্ত আয়াত সমূহ নাজিল হয়। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যিহারের কাফফারা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। [তাফসিরে ইবনে কাসির-সংক্ষেপায়িত]

- ## যিহারের বিধান কী?

ইসলামে যিহার একটি অন্যায় আচরণ এবং হারাম কাজ। কেউ এমনটি করলে তার জন্য কাফফারা আদায় করা আবশ্যক। কাফফারা আদায়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী মিলন হারাম। জাহেলি যুগে যিহার করাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে চিরস্থায়ী ভাবে স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হত। যেমন: তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে,

وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية

"জাহিলি যুগে এটাই স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাক ছিলো।" কিন্তু ইসলাম তা স্থায়ী হারামের পরিবর্তে অস্থায়ী হারামে রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ কোনও স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলে কাফফারা প্রদান করলে তা হালাল হয়ে যাবে।

- ## যিহারের কাফফারা কী?

যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন,

“যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে ফেলে, অতঃপর তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা হল, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্‌ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি।” [সূরা মুজাদিলা: ৩ ও ৪]

অর্থাৎ যিহারের কাফফারা রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কাফফারার অনুরূপ। তা হল:

● ১. একটি মুমিন দাস মুক্ত করা। কিন্তু বর্তমান যুগে দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত না থাকার কারণে তা প্রযোজ্য নয়।

● ২. এটি সম্ভব না হলে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা থাকা। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের হায়েজ বা নেফাস শুরু হলে সে দিনগুলোতে রোজা থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে ঈদ উপলক্ষে রোজা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোজা রাখা থেকে বিরত থাকবে। অত:পর হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র হলে এবং ঈদে রোজা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলো অতিবাহিত হলে যথারীতি রোজা রাখা শুরু করবে।

● ৩. তাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিন (দরিদ্র-অসহায় মানুষ) কে এক বেলা খাবার খাওয়ানো অথবা খাদ্য দ্রব্য দান করা। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ, প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য (যেমন: আমাদের দেশে চাল) থেকে প্রায় সোয়া কেজি। এর সমপরিমাণ টাকা দেওয়া শরিয়ত সম্মত নয়। কারণ কুরআনে খাদ্যদ্রব্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

* * <u>স্ত্রীর পক্ষ থেকে কি স্বামীর সাথে যিহার হয়?</u>

পূর্বোক্ত আয়াতের আলোকে অধিকাংশ আলেম বলেন, যিহার কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে হয়; স্ত্রীর পক্ষ থেকে নয়। কারণ আল্লাহ উক্ত আয়াতে কেবল স্বামীদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

অত:এব কোনও স্ত্রী যদি তার স্বামীকে এভাবে বলে যে, “তুমি আমার জন্য হারাম যেমন আমার জন্য আমার পিতা হারাম অথবা যেমন আমার ভাই আমার জন্য হারাম” তাহলে অধিক বিশুদ্ধ মতে তা ‘যিহার’ বলে গণ্য হবে না। বরং তা হালালকে হারাম করার অন্তর্ভুক্ত। এটিও হারাম ও গুনাহের কাজ।

এটি কসম হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তার করণীয় হল, কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করা।

শাইখ বিন বায রাহ. কে প্রশ্ন করা হয়, কোন হতভাগা স্বামী স্ত্রীকে ‘তুই আমার মা বা মায়ের মত’ বললে ‘যিহার’ হয়। কিন্তু যদি কোন হতভাগী স্ত্রী ‘তুমি আমার পিতা বা পিতার মত’ বলে। তাহলে তার বিধান কি?

তিনি উত্তরে বলেন, “এ ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে যিহার হবে না। কেবল মহিলাকে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে।” [দ্বীনী প্রশ্নোত্তর, বিবাহ ও দাম্পত্য- শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী]

শাইখ আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন রাহ. ও অনুরূপ কথা বলেছেন।

- কসম ভঙ্গের কাফফারা:

● দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরণের খাবার খাওয়ানো। (টাকা দেওয়া শরিয়ত সম্মত নয়)

● অথবা ১০ জন মিসকিন (দরিদ্র-অসহায় মানুষকে) পোশাক দেয়া।

● অথবা একটি দাস মুক্ত করা।

● এ তিনটির কোনটি সম্ভব না হলে (লাগাতার) তিনটি রোজা রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণির খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা কাফফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।” [সূরা মায়িদা: ৮৯]

সুতরাং কেউ যদি আর্থিক সংকটের কারণে উপরোক্ত তিনটি জিনিসের কোনটি দ্বারা কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে লাগাতার তিনটি রোজা রাখবে।

- কোনও ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বা কোনও স্ত্রী তার স্বামীকে তার কোনও মাহরামের সাথে বা তার বিশেষ কোনও অঙ্গের সাথে তুলনা করে তাহলে তার বিধান কী?

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর শারীরিক গঠন, সৌন্দর্য বা গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলে যে, তোমার চোখ দেখতে আমার মায়ের মতো, তোমার চেহারা আমার বোনের মত ইত্যাদি অথবা কোন মহিলা তার স্বামীকে বলে, তোমার দেহের গঠন আমার ভাই বা পিতার মত তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে সম্মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে বা বৈশিষ্টগত ভাবে তুমি আমার মা/বাবার অনুরূপ তাহলেও তা যিহারের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ হারাম করার নিয়ত না থাকলে যিহার বলে গণ্য হবে না। [আল মুগনি-ইবনে কুদামা]

قال ابن قدامة :وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار, والقول قوله في نيته.

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করে সে আলোকে জীবন যাপনের তওফিক দান করুন। আমিন। আল্লাহু আলাম।

লেখকঃ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব। Sisters'Forum In Islam.com